221

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 13 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

অভিমত

কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার হালচাল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

মোঃ নিজামউদ্দিন

বর্তমানে কলেজ পর্যায়ে লেখাপড়ার হালচাল দেখে মনে হয় আমরা ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। প্রকৃত শিক্ষক পাওয়া যাবে না। সুযোগ্য প্রশাসক, জজ, ব্যারিস্টার এবং রাষ্ট্র নায়ক জন্ম নিবে না। উচ্চ শিক্ষার নিদারুণ দুরবস্থার কথা যাদের ছেলেমেয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ছে তারা নিশ্চয়ই কিছুটা অবগত আছেন। আমি শিক্ষক হিসেবে আমাদের অশান্তির কারণ এবং ভিতরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। অভিভাবকগণ অনুগ্রহ করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বর্তমানে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বই পড়ে না, নোট করে লেখাপড়া করে না। ফটোস্ট্যাট করা নোট শুধু নাড়াচাড়া করে। চেয়ারে এক ঘন্টা বসে থাকার ধৈর্য তাদের নেই। ব্যতিক্রম যে নেই আমি তা বলছি না। আমি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে কথাগুলো বলছি। পড়না কেন জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেবে— 'পাস করলে তো হলো। আজকাল বেশি পড়তে হয় না।'

আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকে আমি বলতে পারি ছাত্রছাত্রীরা এখন দলের কাজে ব্যস্ত থাকে, নেতানেত্রীর নির্দেশ মতো চলে। তাদের পোশাক আশাক দেখে মনে হয় তারা সহজ উপায়ে হয়তো টাকাপয়সা পেয়ে থাকে। এরকম দলীয় ছাত্রদের জন্য গোটা পরীক্ষা কেন্দ্র অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। পরীক্ষার হলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছাত্রদের মধ্যে দারুণ ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। আমরা শিক্ষকরা এদের দমন করতে পারি না বিধায় নিরীহ ছাত্রদেরও আর ডিস্টার্ব করি না। তাছাড়া কিছু করতে গিয়ে যদি মরতে হয় অথবা পঙ্গু হয়ে যাই তা হলে তো অন্যান্য বিভাগের মতো আমার পরিবারের সদস্যগণ কিছু পাবে না। পরিবারটি পথে বসবে। কেউ দেখতেও আসবে না। অতএব, কি দরকার। গুণীজনের পরামর্শ মতো আমরা এখন ট্যাকটফুল। শিক্ষক, অভিভাবক, সচেতন নাগরিক এবং রাজনীতিবিদ সকলের স্বচ্ছ আন্তরিকতা এবং একান্তিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বার বার তো এই আহ্বানই জানিয়ে আসছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী সাহেবের মতের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলা যায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা তৈরিতেও ব্যর্থ।

শিক্ষকদের চাকরিগত দুটি অশান্তির কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে কলেজের পেটের বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে আসবো। সরকারি কলেজগুলোতে বিষয়ভিত্তিক সুবিধার কারণে অর্থাৎ বিষয়ে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, ইংরেজি এসব বিভাগের শিক্ষকগণ দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ক্ষেত্র ভেদে সিনিয়রকে ডিঙিয়ে উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ হচ্ছেন। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কোনো হাত নেই। এ রকম ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষক এবং তার সিনিয়র শিক্ষক উভয় পক্ষ মনঃকষ্টে ভোগেন। পরস্পরের মুখোমুখি হলে তারা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এতে প্রশাসনিক কাজে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ রকম ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে পড়ার কথাও শোনা যায়। এ রকম অবস্থা যাতে না হয় তার জন্য একটি কাজ করা যেতে পারে। তাহলো যদি সহযোগী অধ্যাপক পদ থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়ার সময় সরকারি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে জ্যেষ্ঠতা গণনা করে পদোন্নতি দেওয়া হয় তাহলে কোনো সিনিয়রকে ডিঙিয়ে জুনিয়র পদোন্নতি পাবেন না। কোনো সিনিয়র শিক্ষক ইতিমধ্যে যদি সহযোগী অধ্যাপক হতে না পারেন সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন। কিন্তু যদি কোনো সিনিয়র শিক্ষক অন্য কোনো কারণে পিছনে না পড়েন এবং ইতিমধ্যে তিনিও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে তো যোগদানের তারিখ হতে জ্যেষ্ঠতা গণনা করে ঐ সিনিয়রকে পদোন্নতি দেওয়াতে অসুবিধার কিছু নেই। বরং এটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশাসনে সর্বদাই সিনিয়র ব্যক্তির থাকা উচিত। উপরোক্ত উপায়ে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব না হলে সরকারি অন্যান্য চাকরির মতো এখানে সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপকগণের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হলে সিনিয়র শিক্ষকের কিছু বলার থাকবে না।

অশান্তির আর একটি বিষয় আছে, তাহলো, একজন অধ্যক্ষকে একটি কলেজের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের শতভাগ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ কাজটি শিক্ষকগণের সহযোগিতায় করতে হয়। বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকলে খুব ভালো, কম থাকলেও ন্যূনতম দুজন শিক্ষক থাকা অত্যাবশ্যক। শিক্ষক স্বল্পতার জন্য ক্লাস না হলে অধ্যক্ষকে ভীষণ চাপের মধ্যে থাকতে হয়। ছাত্রদের কাছে এজন্য জবাবদিহি করতে হয়। বিভাগে মাত্র দুজন শিক্ষক, এমনিতেই চাপ আছে, এরমধ্যে যদি দেখা যায় তাদের একজন স্ট্যান্ড রিলিজের অর্ডার নিয়ে এসেছেন, সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষের মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা হয়।

একজন অধ্যক্ষকে একটি কলেজের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের শতভাগ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ কাজটি শিক্ষকগণের সহযোগিতায় করতে হয়। বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকলে খুব ভালো, কম থাকলেও ন্যূনতম দুজন শিক্ষক থাকা অত্যাবশ্যক। শিক্ষক স্বল্পতার জন্য ক্লাস না হলে অধ্যক্ষকে ভীষণ চাপের মধ্যে থাকতে হয়। ছাত্রদের কাছে এজন্য জবাবদিহি করতে হয়।

সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ প্রয়োজনেও একজন পিয়ন নিয়োগ করতে পারেন না, শিক্ষক আনতে পারেন না, ধরে রাখতেও পারেন না অথচ কলেজ পরিচালনায় বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হয়। পদটিকে কিছুটা শক্তিশালী করা উচিত বলে শিক্ষক মহল মনে করেন।

কলেজের পেটের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে দুএক কথা বলে এ লেখাটি শেষ করবো। আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যমান ধারাগুলো হলো ১. প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২. উচ্চ বিদ্যালয়, ৩. মহাবিদ্যালয় এবং ৪. বিশ্ববিদ্যালয়। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ রকম কতোগুলো ধাপ আছে। আমি এখানে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে কিছু বলতে চাই। এ দু'পর্যায়ের শিক্ষা সাধারণত দুটি ভিন্ন ভৌত কাঠামোতে হয়ে থাকে। কলেজের পেটে ইদানীং অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নিয়েছে। অনেকে অবশ্য বলেন কলেজের পেটের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো রাজনীতির ফসল। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষকদের পক্ষে এমএ/এমএসসি কোর্স পড়ানো অনেকটা কষ্টকর। আমরা কলেজের শিক্ষকরা মাস্টার্স কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে চাইনি। অথচ আমাদের ওপর ঐ কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে যা হচ্ছে তাহলো, ছাত্রছাত্রীরা নিজ উদ্যোগে ফটোস্ট্যাট করা কিছু নোট সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা দেয়। গাজীপুরের সার্টিফিকেট কারখানা হতে উক্ত পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটও তারা পায়। আমার জানা মতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় এ ধরনের সার্টিফিকেট সর্বস্ব মাস্টার্স ডিগ্রিধারি অধিকাংশ প্রার্থী পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি।

আমরা শিক্ষকরা এবং দেশের সচেতন নাগরিকগণ যে সব পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করছি সেগুলো হলো:

১. অতি শিগগির প্রস্তাবিত ১২টি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১২টি জেলার সর্ববৃহৎ কলেজের ভৌত কাঠামোতে আপাতত কার্যক্রম শুরু করে কলেজ পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করে উচ্চ শিক্ষার ধ্বংসকে কিছুটা হলেও ঠেকাতে হবে।

২. স্থান নির্ধারণ ও বিল্ডিং নির্মাণে সময় নষ্ট না করে আগামী সেশন হতে জেলার বৃহত্তম কলেজকে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার ব্যবস্থা করা যায়।

৩. এসব কলেজের আগ্রহী শিক্ষক এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সের, বিসিএস পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে, ক্যারিয়ারও ভালো এমন শিক্ষককে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুধুমাত্র ডিগ্রি পাস কোর্স এবং শুধু কলেজ পর্যায়ের অনার্স কোর্স থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স কোর্স রাখা মোটেই সমীচীন নয়।

৫. বিদ্যমান পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও নির্মিতব্য ১২টি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে এই ছোট দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতো কম হলো না। এর পরেও কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কোনো যুক্তি নেই। শিক্ষার্থীদেরকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে রেখে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া সরকারের পবিত্র দায়িত্ব।

৬. এছাড়াও অতি শিগগির জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি আঞ্চলিক শাখা খোলা প্রয়োজন। প্রতি বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার ছাড়া দূরত্ব ও অঞ্চলের গুরুত্বের ভিত্তিতে এই আঞ্চলিক শাখা অফিস খোলা জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

৭. আগামী সেশন থেকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি আশা করছি উচ্চ শিক্ষার উন্নতি সাধনে উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সত্যি সত্যিই আন্তরিক হবেন। এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে ধ্বংস থেকে জাতিকে বাঁচাবেন।

মোঃ নিজামউদ্দিন: উপাধ্যক্ষ, রংপুর সরকারি কলেজ।